International Journal of Multidisciplinary Horizon

ISSN: **3049-2017**
IJMH 2026; 3(2): 176-179
© 2026 IJMH
www.themultijournal.com

Received: 25-03-2026
Accepted: 06-04-2026
Publish : 07-04-2026

Sampa Roy
Former Student,
Dept. of Bengali,
Netaji Subhas Open University,
West Bengal, India

Correspondence:
Sampa Roy
Former Student,
Dept. of Bengali,
Netaji Subhas Open University,
West Bengal, India

"ভারতীয় ঐক্য সাধনে - বিশ্লেষণের আলোকে রবীন্দ্রনাথ"

Sampa Roy

Abstract:

ভারতবর্ষ তথা গোটা বিশ্বজুড়ে যার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে তিনি আর কেউ নন, আমাদের সকলের পূজনীয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর কলমের দ্বারা সারা বিশ্বকে জয় করে বিশ্বকবি হিসেবে জয়লাভ করেন। বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, নাট্যকার, গল্পকার, চিত্রকার ও সঙ্গীতজ্ঞ।

তিনি ১৮৬১ সালে ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ ১২৬৮) কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা সারদা দেবী। তিনি প্রথাগতভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন করেননি। তিনি গৃহশিক্ষকের কাছেই তাঁর জ্ঞান অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে পড়াশুনা করেন। তিনি ছেলেবেলা থেকেই বিভিন্ন ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস ও সঙ্গীত রচনা করেন। শান্তিনিকেতনে তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য জগতে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাকে ১৯১৫ সালে নাইট উপাধি দেন। কিন্তু ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া নাইট উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন। দেশের মানুষের প্রতি কবির অগাধ ভালোবাসা ছিল, তেমনি দেশের প্রতিও ছিল তাঁর অকৃত্রিম প্রেম ও শ্রদ্ধা। তাই তো কবির লেখায় সমাজ, শিক্ষা ও কুসংস্কারের কথা যেমন রয়েছে তেমনি দেশবাসীকে এক হওয়ার কথা বলেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে।

জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল মন্ত্র ছিল — **"অন্তরকে ও বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগমুক্ত করে জানা।"**[১] অর্থাৎ কবি বলতে চেয়েছেন নিজের অন্তরের ভিতরে যে ভালো মানুষটি ঘুমিয়ে রয়েছে অর্থাৎ চেতনা শক্তি, তাকে জাগিয়ে তুলে সেই অন্তরদৃষ্টি দিয়ে বাইরের বিশ্বকে দেখলে নিজের আত্মার সঙ্গে সমন্বয় সাধন সম্ভব। কবির মতে আজ বিশ্বের সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আত্মার সমস্যা। তাই এর সমাধানের পথ আত্মার গভীরে। মানুষের আত্মশক্তি অর্থাৎ চেতনা শক্তি জাগ্রত না থাকলেই মানুষ লোভ, লালসা ও কুটিল জীবন যাপন করে। তাই কবি তাঁর বিভিন্ন রচনার দ্বারা ভারত তথা বিশ্ববাসীকে এক হওয়ার মন্ত্রে বাঁধতে চেয়েছেন।

Keywords: ঐক্য, সমাজজীবন, মানবতাবাদ, ধর্ম, দেশপ্রেম, প্রকৃতি।

ভূমিকা:

ভারতবর্ষে তথা গোটা বিশ্বকে এক সূত্রে বেঁধে রাখার মহামন্ত্রের কথা বলেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেছেন মানবপ্রেমই হলো সেই সুতো, যার দ্বারা ভারতবর্ষ তথা গোটা বিশ্বকে এক করে দেখেছেন তিনি। তাঁর বহু রচনায় বারবার ধ্বনিত হয়েছে মহামানবতার মূল মন্ত্র ঐক্য। তিনি তাঁর রচিত গান, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলে সকলের মনে ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। যা নবজাগরণ রূপে ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীকে প্রভাবিত করে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রশ্ন:

উদ্দেশ্য:

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক প্রবাহ ধারা কীভাবে ভারতীয় ঐক্য সাধনে সহায়ক হয়েছিল—তার বিশ্লেষণ এবং বর্তমান সমাজের অতীতকে সামনে রেখে পুনঃজাগরণের চেষ্টা করা।

গবেষণার প্রশ্ন:

1. তাঁর রচনা কীভাবে মানব সমাজকে প্রভাবিত করে?
2. মানব জাতির মধ্যে কি তিনি চেতনা শক্তিকে জাগ্রত করতে পেরেছিলেন?

3. ঐক্য সাধনে ধর্মের প্রভাব কি ছিল?

ভারতীয় ঐক্য সাধনে বিভিন্ন রচনাবলী:

প্রথমেই বুঝতে হবে আমরা ভারতীয় ঐক্য বলতে কি বুঝি বা কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঐক্য বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন। ঐক্য বলতে বোঝায় মিল বা একত্রে বা মিলন। ভারত বিশালায়তন দেশ। এই দেশে রয়েছে বহু ভাষা, জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, রীতি, নীতি, আচার অনুষ্ঠান ও নানা প্রথা। এসব সত্যেও মানুষের মধ্যে পরস্পরিক সম্মান, মহানুভূতি ও সহমর্মিতা, সুখে-দুঃখে একসঙ্গে বেচে থাকার নামই ঐক্য। অর্থাৎ সহজ কথায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই হলো ভারতীয় ঐক্যের মূল মন্ত্র।

এই ঐক্যের ধারণা ভারতবাসীর মনে জাগিয়ে তুলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গান, প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হলো: 'ভারততীর্থ', 'সোনার তরী', 'বসুন্ধরা', কাব্যের জন্য তিনি লেখেন 'গীতাঞ্জলি' কাব্য 'গীতবিতান', এছাড়া রয়েছে 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রাজর্ষি', 'বিসর্জন', 'ডাকঘর', 'আমার সোনার বাংলা', 'জনগণমন', 'গোরা' ইত্যাদি।

"ভারততীর্থ" কবিতায় প্রথমেই কবি বলেছেন—

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের মনকেই বলেছেন, হে আমার মন, পুণ্যভূমি ভারতে ধীরে ধীরে জেগে ওঠো এই মহামানবের সাগরতীরে। অর্থাৎ কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন, বহু দেবতুল্য মহান মুনি ঋষিরা এই ভারতে জন্মগ্রহণ করে ভারতকে পুণ্যতীর্থে পরিণত করেছে। যেখানে দেবতার বাস, যেখানে মন্দির ও মসজিদ রয়েছে সেই জায়গা যেমন পুণ্য তীর্থ নামে পরিচিত, ঠিক তেমনি এই ভারত মহৎ ব্যক্তিদের আগমনে পুণ্য তীর্থরূপে পরিণত হয়েছে। আবহমান কাল থেকে যুগে যুগে ভারতের এই পবিত্র ভূমিতে মহাপুরুষরা ও মনীষীরা জন্মগ্রহণ করে শুধু ভারতকেই নয়, সারা বিশ্বকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। একারণেই কবি এই ভারতকে 'মহামানবের সাগরতীর' বলেছেন।

'ভারততীর্থ' কবিতায় কবি ভারতবর্ষকে জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র বা মহামানবের সাগরতীর রূপে আখ্যা দিয়েছেন। এখানে কবি সকল মানুষ তথা— আর্য, অনার্য, শক, হুন, দ্রাবিড়, চীন, খ্রিষ্টান, হিন্দু-মুসলিম সকল শ্রেণীর লোকেদের এক হয়ে বিভেদ ভুলে এই পবিত্র ধরিত্রীর বুকে মঙ্গলঘট স্থাপন করার কথা বলেছেন। সমস্ত রাগ, অভিমান, ক্ষমতা, দম্ভ ভুলে সকলে নিজেদের সমস্ত খারাপ গুণকে যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিয়ে নিজেদের মন শুচি করে একে অপরের হাত ধরে বিশাল ভারতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে লজ্জা, ঘৃণা ও ভয় কোনোটি থাকবে না, শুধু থাকবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য।

"আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে।"[৩]

"বসুন্ধরা" কবিতায় কবি এই পৃথিবীকে এক জীবন্ত ও স্নেহময়ী মা হিসেবে কল্পনা করেছেন। তিনি এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর সৌন্দর্য ও জীবনের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। পৃথিবীর বুকে থাকা গাছপালা, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, ঝোপঝাড়, বন-জঙ্গল, পাখি, ফুল-ফল এই সবের মধ্যেও তিনি এক অনন্ত আনন্দ ও ঐক্য খুঁজে পেয়েছেন। পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু করে তার সমস্তই পৃথিবীতে থেকে যায়, কিন্তু একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে সকলকেই। এই পৃথিবী আর তাকে আর তাঁর কাছে রাখতে পারবেন না, তাই কবি পৃথিবী মাতাকে বলছে তাকে যেন তাঁর কোলেই স্থান দেন এবং ফিরিয়ে না দেন তার কোলের থেকে। কবি মনে করেন সমস্ত মানুষই পৃথিবীর সন্তান, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গেই পৃথিবীর আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু মানুষ নিজেদের লোভ, লালসা, হিংসা ও স্বার্থপরতায় এতটাই লিপ্ত থাকে যে তারা বুঝতেই পারে না এই সুন্দর সম্পর্ককে। নিজের অজান্তেই তারা এই সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই কবি এই কবিতার দ্বারা মানুষকে আহ্বান করেছেন এবং তাঁদেরকে বলেছেন যে এই পৃথিবী কেবল আমাদের বাসস্থান নয়, এই পৃথিবী আমাদের মা। তাই সকলেই এই মাকে ভালোবাসো, তার সৌন্দর্যকে রক্ষা করো। সকলে মিলেমিশে থাকো, তবে আমাদের ধরিত্রী মা স্বস্তি পাবেন।

ভারতের অমূল্য সম্পদ কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের রচিত "জনগণমন" গান। যা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। এই জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যেও রয়েছে ভারতের বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রদেশের কথা যা দেশের মানুষকে পথনির্দেশক হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সংকটকালীন পরিস্থিতিতে তাঁদের রক্ষা করবে। সকলের সম্মিলিত ঐক্য বৃহত্তর ভারত রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া তিনি "আমার সোনার বাংলা" গানের মাধ্যমে বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা প্রকাশ করেছেন। বাংলার সবুজ ধানের খেত, নদী, ফুল ও বাতাস এসবকিছুই তিনি তাঁর হৃদয়ের আবেগ ও মমতা দিয়ে বর্ণনা করেছেন। বাংলাকে নিজের মায়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দেশের মাটি, গাছপালা ও প্রকৃতি সবকিছুই কবির কাছে খুবই প্রিয়। দেশের সুখে তিনি সুখী হন, আবার দেশের দুঃখে দুঃখিত হন। এই গানেও রয়েছে তাঁর দেশপ্রেম ও মাতৃভূমির প্রতি অগাধ ভালোবাসা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে রয়েছে প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি। এখানেও তিনি আত্মা, পরমাত্মা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি অহংকার ত্যাগ করে সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথাই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর গীতাঞ্জলি মানুষকে শেখায় যে মানুষের প্রকৃত আনন্দ আসে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও মানবসেবার মাধ্যমে। মানব সেবাই হলো ঈশ্বরের সেবা এতেই জীবের মুক্তি লাভ হয়। তিনি এখানেও মানব ধর্মকে বড় করে দেখেছেন।

'রক্তকরবী' নাটকে দেখা যায় একটি কাল্পনিক রাজ্য যক্ষপুরীকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে এই নাটক। নাটকে দেখা যায় একজন স্বার্থপর ও লোভী রাজা মাটি খোদাই করে সোনা সংগ্রহে মত্ত। সাধারণ মানুষকে ধরে এনে জোর করে তাদের দিয়ে এই মাটি খোদাই করানো হতো। তাদের জোর করে অমানবিক অত্যাচার করে আটকে রাখা হতো। এখানে যান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এখানে রাজা সাধারণ মানুষকেও যেন যন্ত্র মনে করতেন এবং যন্ত্রের মতোই তাদের খাটিয়েছে। তাদের দমবন্ধ পরিবেশে আসে এক মুগ্ধ, প্রানবন্ত ও সাহসী মেয়ে। তার নাম নন্দিনী। নন্দিনীকে এখানে স্বাধীনতা, ভালোবাসা ও মানবিকতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। দীর্ঘদিন বন্দি থাকায় সেইসব মানুষের মনে বেঁচে থাকার কোনো আশাই ছিল না। তারা যেন একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্রমানবে পরিণত হয়েছিল। নন্দিনী তাদের মধ্যে নতুন করে বাঁচার আলো জাগিয়ে তোলে। তাদেরকে প্রানবন্ত করে তলে। প্রতিনিয়ত সে তাদের সাহস জোগায় এবং জীবনের অর্থ বুঝতে শেখায়। নন্দিনীর প্রেরণায় রাজ্যের মানুষের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস জাগে এবং তারাও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। নন্দিনীর প্রভাবেই স্বার্থান্ধ ও লোভী রাজা নিজের ভুল উপলব্ধি করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সেই অত্যাচার ও লোভের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এখানে রক্তকরবী ফুল ভালোবাসা, সৌন্দর্য ও প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। রক্তকরবী শুধুই একটি নাটক নয়। এটি দুরাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিবাদ, এটি ভালোবাসা, শোষন ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। শেষ পর্যন্ত এখানে ভালোবাসা ও মানবিকতাই জয়ী হয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং ঐক্যই প্রাধান্য পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকটি ত্রিপুরার রাজাকে কেন্দ্র করে রচিত। এ রাজ্যের রাজা গোবিন্দমাণিক্য ছিলেন একজন অত্যন্ত দয়ালু রাজা। তিনি তাঁর রাজ্য থেকে পশুবলি প্রথা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে রাজ্যের পুরোহিত

রঘুপতি ছিলেন কুসংস্কারে আবদ্ধ ও বলি প্রথার সমর্থক। তার ছিল ব্রহ্ম শাঁপ। তিনি ব্রহ্ম শাঁপের ভয় দেখিয়ে তার কার্য সিদ্ধি করতে চেয়েছিলেন।

ঘোর কলি এসেছে..... । বাহুবল রাহু সম
ব্রহ্মতজ গ্রাসিবার চায়- সিংহাসন।[৪]

রঘুপতি বিশ্বাস করে মন্দিরের দেবীকে খুশি করতে চাইলে পশুবলি দিতেই হবে। তিনি তার ক্ষমতাকে কায়েম রাখার জন্য এই প্রথা বন্ধ করতে চান না। তাই তিনি তাঁর শিষ্য জয়সিংহকে এই অন্ধ বিশ্বাসের শিকার বানান। এই অন্ধ বিশ্বাসের সঙ্গী তিনি রাজ্যের মহিষী গুণবতীকেও মানতে বাধ্য করেন। ব্রহ্ম শাপে ভয় পেয়ে গুণবতী রাজাকে বলে – **"যাও ফিরে আর দেখাইও না মুখ"।**[৫] শেষ পর্যন্ত রঘুপতির শিষ্য জয় সিংহ বুঝতে পারে যে এই বলি প্রথা অমানবিক। সংঘাত যখন চরমে ওঠে—একদিকে কুসংস্কার ও অপরদিকে মানবিকতা—শেষে মানবিকতারই জয় হয় জয়সিংহের জীবন বিসর্জনের মাধ্যমে। এখানে জয়সিংহের এই আত্মবলিদানের মাধ্যমে মানবতার জাগরণ ঘটে। রাজা গোবিন্দমাণিক্যের দ্বারা মানবিকতা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বলি প্রথা, অন্ধ বিশ্বাস বন্ধ হয়। নৈতিকতার জয় হয়। এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। দয়া, মায়া ও মানবিকতাই হলো সত্যিকারের মানবধর্ম। এই ধর্ম রক্ষা পেলে ঐক্য বজায় থাকবে।

'মুক্তধারা' নাটকের পটভূমি — উত্তরকুট ও শিবতরাই নামে দুটি রাজ্য। এই নাটকেও স্বাধীনতা ও মানবিকতার শক্তিকে তুলে ধরা হয়েছে। উত্তয়কুটের রাজা ছিলেন খুবই লোভী। তিনি শিবতরাই এর ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শিবতরাই রাজ্যের জীবনযাত্রা নির্ভর করত প্রাকৃতিক ঝরনার ওপর, যা মুক্তধারা নামে পরিচিত। উত্তয়কূটের রাজা সেই জলধারাকে বন্ধ করার জন্য একটি বাঁধ তৈরি করেন। তিনি ভাবেন এভাবে ঝরনার জলধারা বন্ধ করে দিলে শিবতরাই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু তারা আত্মসমর্পণ করেনা। তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ওপারের গানটিতে কবি দেখিয়েছেন—

"আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের ব্যয়ে
আমার ভয় ভাঙা এই নায়ে।
মাভৈ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেড়া পালে বুক ফুলিয়ে
তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী।"[৬]

গানের মাধ্যমে তারা প্রতিবাদ জানায়। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে রাজপুত্র অভিজিৎ। সে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং স্বাধীনতা ও মানবিকতার পথে প্রতিবাদ করে। সে বুঝতে পারে প্রাকৃতিক এই জলপ্রপাত এটা আটকানো মোটেও ঠিক নয়। এটি অন্যায়। শেষ পর্যন্ত অভিজিত নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে নদীতে নির্মিত বাঁধ ভেঙে দেয় এবং শিবতরাই-এর মানুষদের কষ্টের থেকে মুক্তি দেয় এবং ঐক্যতা রক্ষা করে। কবি রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে কোনো শক্তির ক্ষমতা নেই প্রকৃতির সম্পদকে আটকে রাখার এবং মানুষের স্বাধীনতাকে চিরকাল হরণ করে রাখার। শেষ পর্যন্ত মানবতা ও ত্যাগই জয়লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি লেখা হয়েছে তিনটি প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে—নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ। নিখিলেশ ছিলেন একজন উদার, নীতিবিদ ও শিক্ষিত জমিদার। তিনি নারীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তিনি তাঁর স্ত্রীকে ঘরে-বাইরে সব জায়গায় সবার সঙ্গে পরিচিত করতে চান। তিনি নারীকে বন্দি রাখতে বিশ্বাসী ছিলেন না। অপর দিকে বিমলা প্রথমে ঘরোয়া হলেও আস্তে আস্তে সমাজের বাইরের দিকে আকর্ষিত হয়। এই উপন্যাসটি স্বদেশী আন্দোলনকে ভিত্তি করে রচিত হয়। উপন্যাসের অপর চরিত্র সন্দীপ—স্বদেশী আন্দোলনের নামে বিমলাকে তাঁর প্রতি আকর্ষিত করে। কিন্তু বিমলা পরে বুঝতে পারে সন্দীপের স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামি। সন্দীপের মাধ্যমে এই আন্দোলন সমাজে হিংসা ও অশান্তির আগুন চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। নিখিলেশ এর ঘোর বিরোধিতা করে। সেই সময় বিদেশী বস্ত্র বর্জনের কথা বলা হয়। কবি বলেন—আজ আমাদের ধর্ম কর্ম বিচার না করে নির্বকার হয়ে পাপকে রক্ত চন্দন পরতে হবে। দেশের মেয়েদের দিয়ে বরণ করাতে হবে।

"এসো পাপ, এসো সুন্দরী"
তব চুম্বন – অগ্নি-মদিরা রক্তে
ফিরুক সঞ্চারি।
অকল্যানের বাজুক শঙ্খ
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক
নির্লাজ কালো কলুষপঙ্ক
বুকে দাও প্রলয়ংকরী।"[৭]

কবি বলেন আজ আমাদের আর ভালো মানুষ সেজে নিরব থাকলে চলবে না। দুষ্টের দমন করতে আজ আমাদের পাপ করতে হবে। অকল্যানকে নষ্ট করে কল্যান ফিরিয়ে আনতে হবে। এতে ললাটে কলঙ্ক লাগলেও বুকের নির্লাজপ্রলয়ংকারী রূপকেবাইরে বের করতেই হবে। প্রলোভনের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। ঘরে বাইরে রাজনীতির দ্বন্ধের অবসান করতে হবে। উগ্র দেশপ্রেম সমাজের ক্ষতি করে। সত্যিকারের উন্নতি আসে মানবতা, নৈতিকতা ও বিবেকের মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হলো 'গোরা' উপন্যাস, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও জাতীয়তাবাদের গভীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গোরা উপন্যাসের কাহিনী গোরা নামক এক যুবককে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। কাহিনীর নায়ক ছিলেন একজন ব্রিটিশ-আইরিশ দম্পতির পুত্র। কিন্তু একথা গোরা অবগত ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুধর্মের কঠোর অনুসারী ছিলেন। তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষের শক্তি হিন্দু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত। বিনয় ছিলেন গোরার একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর স্বভাব সরল ও উদার প্রকৃতির।

তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত পরেশবাবুর ভাবাদর্শে নতুন নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন। গোরা প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজ ও তাঁর চিন্তাধারাকে সমর্থন করতেন না। কিন্তু ধীরে ধীরে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে গোরার পরিবর্তন ঘটে। গোরার জীবনে সবচেয়ে গুরিত্বপূর্ণ মোর আসে গোরার জীবনের সত্যকে যখন জানতে পারে তার মধ্য দিয়ে। সে যখন জানতে পারে যে সে হিন্দু নয়—সে একজন ব্রিটিশ-আইরিশ সন্তান—তখন সে জীবনের প্রকৃত সত্যকে বুঝতে পারে এবং মানবপ্রেমে নিজেকে সিক্ত করে। সে বুঝতে পারে জাতি, ধর্ম, ভাষা, উঁচু, নিচু সব কিছুর উর্ধ্বে রয়েছে মানব ধর্ম—মানুষের মধ্যে ঐক্যতা বজায় রাখাই হলো আসল ধর্ম।

ভারতীয় ঐক্য নিয়ে অনেক গবেষক গবেষণা করেছেন। তাঁরা জাতীয়তাবাদ, সমাজ বিজ্ঞান, রাজনৈতিক গবেষণা, সাংস্কৃতিক গবেষণা ও অর্থনৈতিক গবেষণা করেছেন। কিন্তু শুধু ভারতীয় ঐক্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই গবেষণা খুব বেশি হয়নি। এখানে এই বিষয়ে গবেষণা করা হবে। কারণ এখানে গবেষণার কিছু ফাক রয়েছে।

বিভিন্ন পুস্তক, পুস্তিকা অধ্যায়ন করে এই গবেষণা করা হয়। যেমন—বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রচিত গ্রন্থ 'রবীন্দ্র জীবনী'তে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক অবদানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা বিকাশে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বহু আলোচনার শেষে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেয়েই ক্ষান্ত হননি, সারা বিশ্বে কবি হিসেবে সম্মান অর্জন করেছেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন কবি নন, তিনি ছিলেন মানবকল্যাণী চিন্তাবিদ। তিনি জাতি ধর্মের উর্ধ্বে উঠে মানুষের ঐক্য ও মানবতার কথা বলেছেন। রবীন্দ্রঠাকুরের সমাজ

সংস্কারের প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সাহিত্য শিক্ষা ও সমাজ চিন্তায় অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁর জীবন ছিল সৃজনশীল ও স্বাধীন চিন্তা এবং মানবতার এক অনন্য উদাহরণ।

প্রমথনাথ বিশী তাঁর সমালোচনায় দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রেম ও বিশ্বমানবতার ধারণা খুবই শক্তিশালী। তিনি মানুষের সকল ভেদাভেদ ভুলে পাশাপাশি থাকার কথা বলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প ও উপন্যাস নিয়ে নানা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন রবীন্দ্রঠাকুর তাঁর রচনার দ্বারা ঐক্যের কথা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিশী রবীন্দ্রনাথের ধর্ম, আত্মা ও জীবন দর্শন নিয়েও বিশ্লেষণ করেছেন। অবশেষে মানব প্রেমে ঐক্যের কথা বলেছেন। বিশী শুধু রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করেননি, অনেক ক্ষেত্রে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় অনেক কল্পনা অতিরিক্ত আদর্শবাদী। বাস্তবজীবনে তা সব সময় প্রয়োগ করা কঠিন।

সমালোচক আদীত্য ওহাদেদার রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় প্রথমেই বলেন— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আমাদের যে সাহিত্য দিয়েছেন তা আমাদের অমূল্য সম্পদ, আমাদের এক বিরাট প্রাপ্তি ও চ্যালেঞ্জ। সেই সঙ্গে একটি সুযোগও প্রদান করেছেন সমালোচনা সাহিত্য গড়ে তোলার। তাঁর মতে— **"উচ্চাঙ্গ সমালোচনার জন্য চাই উচ্চাঙ্গ সাহিত্য"**।[৮] রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছেন সেই সাহিত্য। আর সেই সাহিত্যের কত না রূপ, কত না বিভাগ। লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিকে গভীর ভাবে উপভোগ করতেন। তিনি তাঁর লেখনীতে জানান— **"বৃক্ষ তলায় যেন একটি স্বর্ণমূর্তি স্থাপিত হয়েছে।"**[৯] লেখক জানতে পারলেন— তিনি আর কেউ না মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ। লেখক তাঁর রূপ, পোশাক, হাসিমুখ দেখে ও শেষে তাঁর কণ্ঠ সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি বলেন— **"মধুর কামিনী-লাঞ্ছন কণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।"**[১০] লেখক কবির গুনে রূপে কণ্ঠে মহিত হন। লেখক তাঁর বহু কবিতা উপন্যামস প্রবন্ধ, প্রহসন, সাংকেতিক রূপক সব কিছুই সমালোচনা করে তিনি ঘোষণা করেন যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার অদ্বিতীয় কবি। কবির বিলেত নিয়ে অনেকে বলেন— কবির নাকি বিলেত বাসীর প্রতি গভীর মমত্ব রয়েছে। কিছু সমালোচক বলেন— **"কবি ফলবন মধু আহরন করেছেন ঘরকে সঞ্চয় সমৃদ্ধ করার জন্য। কিন্তু তার রচনায় বিজাতীয়তা ভাব নেই।"**[১১] লেখক রবীন্দ্রনাথের নানা ভাবে সমালোচনা করেছেন যেমন— দার্শনিক, জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধক, প্রকৃতি প্রেম সব কিছুরই সমালোচনা করেন। সমালোচনায় কবির সৌন্দর্য বোধ, সমাজ প্রেম, এসবই উঠে আসে। শেষে তিনি একথা বলেন— রবীন্দ্র সাহিত্যের সমালোচনা প্রকৃত ভাবে একনো শুরু হয়নি।

এই গবেষণায় রবীন্দ্রনাথের রচিত বিভিন্ন নাটক, গান, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও বিভিন্ন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐক্য সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গেছেন। তিনি ভারতের মানুষের তথা গোটা বিশ্বের মানুষের মনে ঐক্য ভাবনা জাগিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন হৃদয়স্পর্শী রচনা করে গেছেন। তাঁর রচনায় সৌন্দর্যে ভাষার রূপকে রয়েছে দেশাত্মবোধক, আধ্যাত্মিকতা ও সম্যের জয়গান। তিনি তাঁর রচনাতে ধরিত্রীকে মাতৃত্বের আসনে বসিয়েছে। তার সৌন্দর্য, মমত্ব ও মাতৃত্বের ভাবকে সুন্দর ভাবে জগৎ বাসীর কাছে ফুটিয়ে তুলেছেন। বার বার তার রচনাতে দেখা গেছে জগৎবাসীকে আহ্বান করে বলতে তারা যেন ক্ষোপ, অহংকার, ভেদাভেদ ভুলে সবাই একসূত্রে নিজেদের গেথে ভারতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করার কথা। ভারতীয় ঐক্যকে কঠোর হাতে রক্ষা করা। ভাত্রিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকা। সকলে একসঙ্গে ভেদাভেদ প্রথা ভুলে গিয়ে— মোরা ভারতবাসী এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সকলে হাতে হাত ধরে বিশ্ববাসীকে বুঝিয়ে দাও আমরা ভারতবাসী। মহাপুণ্য তীর্থ— এই ভারত। মহাপুরুষ ও মহর্ষিদের জন্মভূমি— এই ভারত। পবিত্র এই ভারতের পুণ্য ভূমিতেই জন্ম নিয়েছিল মহান ব্যক্তিরা তারা ছিলেন গোটা বিশ্বের পথ নির্দেশক। আমরা সবাই আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের নরদেবতা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চলব।

এই গবেষণার দুর্বল দিক হলো— রবীন্দ্র ঠাকুরের এত রচনা রয়েছে এছাড়া এত সমালোচনা গ্রন্থ রয়েছে অল্প সময়ে তা কখনো পড়া সম্ভব নয়। তাই গবেষণার কাজ অবশ্যই অসম্পূর্ণ। তা নিয়ে ভবিষ্যতে আরও গবেষণা করা যেতে পারে।

বহু গুণের অধিকারী এই মহামানব ভারতের বুকে জ্বালিয়ে গেছেন চেতনার আলো। শিখিয়েছেন বিশ্ববাসীকে মানব জীবনের প্রকৃত অর্থ। তিনি জাগিয়ে তুলেছেন ঘুমন্ত আত্মাকে। পড়িয়েছেন ঐক্যের পাঠ। তার রচনায় যুগ যুগ ধরে নবচেতনার উন্মেষ ঘটাবে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে জাগ্রত করবে। ধ্বংস করবে সাম্রাজ্যবাদ। জন্ম দেবে ঐক্যতা বাদ।

Bibliography:

1. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; **রক্তকরবী নতুন পাঠ**, সম্পাদনা, অজিত কুমার ঘোষ, প্রজ্ঞা বিকাশ, ৯/৩, রামানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯।
2. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; **গল্পগুচ্ছ**, বিশ্বভারতী, ১৩৩৮ পৌষ। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪০ ফাল্গুন, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৪৪ শ্রাবণ।
3. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; **গীতবিতান**, শ্রী সুধাংশু শেখর ঘোষ, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা – ১৭।
4. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; **সোনার তরী**, মনিমুকুট মিত্র, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড ১৭, ১৩০০।
5. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; **বিসর্জন**, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭, দ্বিতীয় সংস্করণ আষাঢ় ১৩০৬।
6. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; **মুক্তধারা**, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৭৭/এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯।
7. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; **ঘরে বাইরে**, রতন লাল রায়, ১২/এ, যুথিকা বুক স্টল ১২, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩।
8. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ; **গোরা**, www.bengaliebook.com
9. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত; **রবীন্দ্র জীবনী - ১**, শ্রী কানাই সামন্ত, বিশ্বভারতী, ৬/৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৪০ অগ্রহায়ণ।
10. বিশী, শ্রী প্রমথনাথ; **রবীন্দ্র-বিচিত্রা**, শ্রী প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ১২।
11. ওহদেদার, আদিত্য; **রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনার ধারা**, শ্রী বিভূতিভূষণ ঘোষ, এভারেস্ট বুক হাউস, ১৪ সাউথ সিঁথি রোড কলকাতা - ৩০।

Endnotes:

1. রক্তকরবী নতুন পাঠ, পৃষ্ঠা-৪
2. সঞ্চয়িতা, পৃষ্ঠা-৫০৬
3. সোনার তরী, পৃষ্ঠা-১৪২
4. বিসর্জন, পৃষ্ঠা-২৭
5. বিসর্জন, পৃষ্ঠা - ৩৫
6. মুক্তধারা, পৃষ্ঠা-২৭
7. ঘরে বাইরে, পৃষ্ঠা- ১৯
8. রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা, নিবেদন পাঠ্য পৃষ্ঠা - ১০
9. রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা, পৃষ্ঠা-৬
10. রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা, পৃষ্ঠা-৬
11. রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনার ধারা, পৃষ্ঠা-১৬